ইতিহাসে হাতেখড়ি

দেশভাগ

অন্বেষা সেনগুপ্ত

ছবি

রঞ্জিত চিত্রকর
সিরাজউদ্দৌলা চিত্রকর

IDSK

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

ইতিহাসে হাতেখড়ি: দেশভাগ

লেখা - অন্বেষা সেনগুপ্ত

কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২২

ইতিহাসে হাতেখড়ি: দেশভাগ
কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২২

লেখা - অন্বেষা সেনগুপ্ত
সম্পাদনা – অন্বেষা সেনগুপ্ত, দেবারতি বাগচী
ছবি– রঞ্জিত চিত্রকর, সিরাজউদ্দৌলা চিত্রকর
প্রচ্ছদ, মানচিত্র ও পরিকল্পনা – ওয়াসিম হেলাল
মুদ্রণ – এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
প্রকাশক - ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা
ডিডি ২৭/ডি, সেক্টর ১, কলকাতা - ৭০০০৬৪
ওয়েবসাইট - www.idsk.in
ইমেইল - idsk@idskmail.com / office@idsk.edu.in

আর্থিক সহায়তা – রোসা লুক্সেমবুর্গ স্টিফটুং, লিয়াসঁ অফিস, নয়া দিল্লী
সি -১৫, এস ডি এ মার্কেট, নয়া দিল্লী - ১১০০১৬
ওয়েবসাইট – https://www.rosalux.in
ইমেইল - south-asia@rosalux.org
এই বইটি শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি/অসরকারি প্রতিষ্ঠান, নীতি নির্ধারক সংস্থা, সংবাদ মাধ্যম, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

This publication is sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with grants from the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. This publication or parts of it can be used by others for free as long as they provide a proper reference to the original publication.
The content of the publication is the sole responsibility of the partner and does not necessarily reflect a position of RLS.

সূচিপত্র

১। ভারত, পাকিস্তান	৭
২। ভাগাভাগির হিসাব নিকাশ	১৯
৩। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের ছুরি	২৫
৪। ভাত, রুটি, ছেড়ে আসা দেশ	৩১
৫। বীথি দিদিমণির কথা	৩৯
৬। সাগর পাড়ি	৪৫
৭। শেষের কথা	৫১
৮। লেখক ও শিল্পী পরিচয়	৫৪

ভারত ও পাকিস্তান, গার্ডিয়ান কাগজে ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট প্রকাশিত মানচিত্র অনুসারে আঁকা

ইতিহাসে হাতেখড়ি: দেশভাগ

(১) ভারত, পাকিস্তান

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের কথা। ১৪ আর ১৫ তারিখ — এই দু'টো দিনে তৈরি হয়েছিল পাশাপাশি দুটো স্বাধীন দেশ। একটা দেশের নাম ভারত, আর অন্য দেশটা হল পাকিস্তান। আজকের পাকিস্তানের সঙ্গে অবশ্য ১৯৪৭ সালের পাকিস্তানের মিল ছিল না। পাকিস্তানের তখন দুটো টুকরো। ভারতের পুব দিকে একটা, আর পশ্চিমে অন্যটা। এই পুবের টুকরোটাই ১৯৭১ সালে আলাদা হয়ে তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশ।

ভারত-পাকিস্তান হওয়ার আগে প্রায় দু'শো বছর ধরে এই গোটা জায়গাটা জুড়েই রাজত্ব ছিল ব্রিটিশ সাহেবদের; আর ভারত বা ইন্ডিয়া নামে পরিচিত ছিল পুরোটা। ব্রিটিশরা আসার আগে এই অঞ্চলে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন মুঘল বাদশারা – সম্রাট বাবর, তাঁর ছেলে হুমায়ূন, নাতি আকবর, নাতির নাতি শাহজাহান, আর তাঁদের বংশধরেরা। ব্রিটিশরা যখন এলেন তখন অবশ্য মুঘলদের শক্তি কমেছে অনেক, আর নানা জায়গায় ছোট ছোট রাজত্ব তৈরি করেছেন সেখানকার রাজা বা জমিদারেরা। দিল্লিতে মুঘল বাদশা আর নানা জায়গায় ছোটবড় রাজারাজড়া নিয়ে একরকম ছিলেন দেশের মানুষ। সাহেবরা আসার পর ঢেলে সাজানো হল দেশের শাসনব্যবস্থা, একের পর এক রাজার রাজত্ব গেল; মুঘল সম্রাটেরও দিল্লির পাট চুকল। জাঁকিয়ে বসলেন বড়লাট, ছোটলাট আর তাঁদের সহকারীরা। সবার উপরে রইলেন ব্রিটিশ

রাজা-রানি। তাঁরা অবশ্য ইংল্যান্ড থেকেই খবর রাখতেন এদেশের।

ব্রিটিশ রাজা-রানির শাসনে ভারতবর্ষের মানুষ নানা কারণে ভাল ছিলেন না। তাঁরা চাইতেন দেশের মানুষই দেশ চালান, বিদেশি মানুষ না। বহুদিন ধরে দল তৈরি করে, রাস্তায় নেমে মিছিল করে, বন্ধ ডেকে, নানা আন্দোলন করে অবশেষে তাঁরা মুক্তি পেয়েছিলেন ব্রিটিশদের হাত থেকে—দেশে এসেছিল স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার সময়ে দু-দুটো দেশ কেন তৈরি হল ব্রিটিশ ভারত ভেঙে? সেই গল্পটাই বলি।

ব্রিটিশরা যখন ভারত শাসন করছেন, তখন ভারতের মানুষ তাঁদের কাছে নিজেদের দাবি-দাওয়া পৌঁছে দেওয়ার জন্য, আর নিজেদের লড়াই শক্তিশালী করার জন্য, নানা দল তৈরি করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে যেমন তৈরি হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, আজও যে দলটি আমাদের দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৬ সালে তৈরি হয়েছিল মুসলিম লীগ বলে আরেকটি দল। আর এই দুই দলের রেষারেষি, মন-কষাকষির মধ্যেই পণ্ডিতরা ব্রিটিশ ভারত ভাগের কারণ খুঁজে পেয়েছেন।

প্রথম থেকেই লীগ আর কংগ্রেসের মধ্যে ছিল ঝগড়া। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতো কিছু মুসলমান নেতা কংগ্রেসে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু আদতে কংগ্রেস তখন ছিল প্রায় পুরোটাই হিন্দু নেতাকর্মীদের নিয়ে তৈরি একটা দল। কংগ্রেসের নেতারা বারবার বলতেন যে, তাঁদের

দলের দরজা সবার জন্য খোলা এবং তাঁরা দেশের সব মানুষের প্রতিনিধি। তবে যে কোনও কারণেই হোক, তাঁদের সঙ্গে মুসলমান সমাজের একটু দূরত্ব সবসময়ই ছিল। অন্যদিকে, নামটা শুনেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেই পেরেছ, লীগ ছিল মুসলমানদের দল।

আমাদের এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান যুগ যুগ ধরে একসঙ্গে বসবাস করেছেন; তাঁদের মধ্যে ভাব-ভালবাসার শেষ নেই। মুঘল বাদশারাই ছিলেন মুসলমান আর তাঁদের প্রজাদের মধ্যে ছিলেন দু-ধর্মেরই মানুষ। কোনও কোনও বাদশা নিজের ধর্মের প্রজাদের একটু বেশী সুবিধা-সুযোগ দিলেও অনেকেই কিন্তু সকলকে সমান চোখে দেখতেন। তবে চিরকালই দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে অবশ্য এমন কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা মনে করতেন যে তাঁদের ধর্মই সেরা। অন্যের আচার-ব্যবহার, পুজো-পরবে তাঁরা বাধা দিতেন। ব্রিটিশ আমলে ইতিহাস টেনে এনে কোনও কোনও মুসলমান বলতেন ভারতে আবার মুঘলদের শাসন দরকার। আবার কোনও কোনও হিন্দু মনে করতেন মুঘলরাও ব্রিটিশদের মতই বিদেশি, একমাত্র হিন্দুরাই আসল ভারতীয়।

আর একটা সমস্যা ছিল। ব্রিটিশ ভারতের এক এক জায়গায় এক এক ধর্মের মানুষের সংখ্যা, ক্ষমতা, টাকা-পয়সা বেশি ছিল। যেখানে যাঁরা বেশি শক্তিশালী ছিলেন, সেখানে তাঁরা অনেক সময়েই দুর্বলের উপর নানা অত্যাচার করতেন। পূর্ব বাংলার কথাই বলি, আজ যার নাম

বাংলাদেশ। এখানে ব্রিটিশ আমলে বেশিরভাগ জমিদারই ছিলেন উঁচু জাতের হিন্দু। আর চাষিরা ছিলেন মূলত মুসলমান ও নিচু জাতের হিন্দু। জমিদাররা তাঁদের প্রজাদের নানাভাবে অত্যাচার করতেন। অন্যায়ভাবে টাকা নিতেন, দিন-রাত তাঁদেরকে দিয়ে খাটাতেন, জাত-পাতের দোহাই দিয়ে তাঁদের ঘরে ঢুকতে দিতেন না আর তাঁদের হতের জলও খেতেন না। চাষিদের ভারী রাগ হত, মাঝে মাঝেই তাঁরা দল বেঁধে প্রতিবাদও করতেন। মুসলমান চাষির হিন্দু জমিদারের সঙ্গে যখন ঝগড়া বাঁধত, তখন কিন্তু তা যেমন ছিল মুসলমান-হিন্দু লড়াই, তেমনই ছিল চাষি-জমিদারেরও লড়াই। মোট কথা, নানা কারণে নানা সময়ে দেশের নানা জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অশান্তি হত।

ব্রিটিশ সরকারও এই লড়াইয়ে ভারী উৎসাহ দিতেন। তাঁরা জানতেন যে দেশের হিন্দু-মুসলমান তাঁদের বিরুদ্ধে একজোট হলে খুবই বিপদ। যতদিন নিজেরা মারপিট করবে, ততদিন সাহেব তাড়াতে মন দেবে না দেশের লোক। আর যেহেতু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া লেগেই থাকত, তাই তাঁদের দল কংগ্রেস ও লীগের মধ্যেও ছিল প্রতিযোগিতা। তবে আগেও বলেছি, আবার বলি যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাব-ভালবাসাও কম ছিল না। কংগ্রেসের নেতা মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু বা মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ, বাংলার আর একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ফজলুল হক কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি

মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না; ধর্মের নামে লড়াই-দাঙ্গাও পছন্দ করতেন না। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে অনেকসময়েই তাঁরা ও তাঁদের দল একজোট হয়ে নামত।

তবে এই ছবিটা বদলে যাওয়া শুরু করল ১৯৩৫এর পর। সে বছর ব্রিটিশ সরকার দেশে বেশ কিছু নতুন নিয়ম চালু করলেন। সেই সব নিয়মকে একসঙ্গে বলা হয় 'ভারত শাসন আইন ১৯৩৫'। এই আইনে ভারতীয়দের হাতে দেশ চালানোর জন্য আগের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়। কী রকম সেই ক্ষমতা? ভারত শাসন আইন চালু হওয়ার আগেও অল্প কিছু ভারতীয় ভোট দিতে পারতেন। কিন্তু তখন অনেক বেশি বাছবিচার করে ঠিক করা হত যে কে ভোট দেওয়ার যোগ্য আর কে নয়। ১৯৩৫ এর আইনে বলা হল একুশ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের ভারতীয়দের নিজেদের নামে বাড়ি, জমি বা তেমন কোনও সম্পত্তি থাকলে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। এই যে ভোটের কথা বলছি, সেই ভোটে দাঁড়াতেন ভারতীয়রাই। অবশ্য রাজ্যে সাহেব গভর্নর আর দিল্লিতে সাহেব বড়লাটের তুলনায় এই ভোটে-জেতা ভারতীয়দের ক্ষমতা তখনও ছিল অনেকটাই কম।

আর একটা কথা বলে রাখি, ব্রিটিশ ভারতে সেপারেট ইলেক্টোরেট বা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বলে একটা ব্যাপার ছিল। পৃথক মানে আলাদা, আর নির্বাচক মানে যাঁরা ভোট দেবেন বা ভোটার। ধর্মের পরিচিতিকে সামনে রেখে আলাদা আলাদা ভোটারদের দল তৈরি করা হল।

একেই বলা হল পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বা সেপারেট ইলেক্টোরেট। মানে মুসলমান ভোটারদের আলাদা দল, হিন্দুদের আলাদা। হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলী শুধু হিন্দু নেতাদেরই ভোট দিতে পারবেন, এবং মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী শুধু মুসলমান নেতাদের। এই ছিল তখন নিয়ম। কংগ্রেস ছিল সেপারেট ইলেক্টোরেটের বিরুদ্ধে আর লীগ ছিল সেই ব্যবস্থার পক্ষে। কেন দুই দলের মত ছিল আলাদা, একটু বুঝিয়ে বলি। নানা কারণে ব্রিটিশ আমলে মুসলমানরা লেখাপড়া, চাকরির জগতে আর রাজনীতির মঞ্চে পিছিয়ে ছিলেন দেশের হিন্দুদের তুলনায়। এই তফাৎ মেটানোর জন্য মহম্মদ আলি জিন্নাহ মনে করতেন যে মুসলমান সমাজের বলিয়ে-কইয়ে, ভাল নেতাদের ভোটে জিতে আসা দরকার। মুসলমান নেতারাই তাঁদের ভাল-মন্দ বুঝবেন, অন্য কেউ নয়। মুসলমান সমাজ কাকে তাঁদের নেতা হিসাবে চায়, তা বোঝার জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী তৈরি করাই একমাত্র উপায়।

কংগ্রেসের নেতারা পিছিয়ে-পড়া নানা ধর্মের বা জাতের লোকেদের আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি কখনও মানেননি। তাঁরা মনে করতেন যে, ভারতীয়দের আসল শত্রু ব্রিটিশ। সকলকে একজোট হয়ে আগে তাঁদের তাড়াতে হবে। নিজেদের দাবিদাওয়া, চাওয়া-পাওয়ার হিসাব হবে পরে। আর এই কাজে কারা পথ দেখাবেন, তা সবাই মিলে ঠিক হওয়া উচিত। হিন্দুদের আলাদা নেতা, মুসলমানদের আলাদা, এমন হওয়া উচিত নয়। এখানে বলে রাখি, ব্রিটিশ

ভারতের দলিত সমাজের সবচেয়ে বড় নেতা বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকরও কিন্তু জিন্নাহর মতো একই যুক্তিতে দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী চেয়েছিলেন। হিন্দু সমাজে যাঁদের 'নিচু জাত' হিসাবে দেখা হয়, তাঁরা নিজেদের বলেন 'দলিত'। গান্ধীজি এঁদেরই বলতেন 'হরিজন' বা ভগবানের লোক। গান্ধীজির বিরোধিতায় দলিত সমাজের জন্য আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি থেকে আম্বেদকর শেষমেশ সরে আসতে বাধ্য হন।

ভারত শাসন আইনের পর দেশের প্রদেশগুলোয় প্রথম ভোট হল ১৯৩৭ সালে। সেই ভোটে সব জায়গাতেই কংগ্রেস জিতল, আর মোটেই ভাল ফল হল না লীগের। দেশের নানা জায়গায় মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলী লীগের লোককে ভোট না দিয়ে কংগ্রেসের মুসলিম প্রতিনিধিকে ভোট দিয়েছিলেন। ভোটের ফলাফল দেখে মনে হল যে কংগ্রেস সত্যিই সব ধর্মের মানুষের দল। আর লীগকে যেন মুসলমানরাও তেমন পছন্দ করেন না। এরপর কংগ্রেসের ভারী দেমাক হল। নেহরু বললেন যে, ভারতবর্ষে কংগ্রেস আর ব্রিটিশ সরকার এই দুটোই দল, লীগের কোনও গুরুত্ব নেই। এমন কথায় রাগে দুঃখে ভেঙে পড়লেন জিন্নাহ। নানা প্রদেশের মুসলমানও আস্তে আস্তে ভয় পেতে শুরু করলেন কংগ্রেসের দেমাক দেখে। তাঁরা অনেকেই কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের প্রিয় নেতা জিন্নাহর প্রতি এমন ব্যবহার তাঁদের ভাল লাগেনি। আর ওই যে বললাম আগেই, কংগ্রেসে নেতাদের মধ্যে হিন্দুই বেশি, মুসলমান হাতে

গোনা। তাই দেশের মুসলমানদের ভয় হল যে, এবার থেকে তাঁদের বুঝি দুই মনিব — ব্রিটিশ সাহেব আর হিন্দু কংগ্রেসি বাবু। অনেক ইতিহাসবিদ বলেন যে, দেশভাগের কারণ লুকিয়ে আছে এই ১৯৩৭-এর নির্বাচনেই। এই সময় থেকেই জিন্নাহ বোঝেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্ভব নয়। লীগকে আবার দাঁড় করাতে হবে, শক্তিশালী করে তুলতে হবে, আর মুসলমানদের ক্ষমতায় বসতে হবে।

তবে পাকিস্তান তৈরির কথা কিন্তু তখনও জিন্নাহ বা দেশের অন্য মুসলমানদের মাথায় আসেনি। আরও তিন বছর পর, ১৯৪০ সালে লাহোরে লীগের মিটিংয়ে প্রথমবার মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা দেশ তৈরির কথা ওঠে। অবশ্য এই মিটিংয়ে কেউই সরাসরি ‘পাকিস্তান’ শব্দটি বলেননি। কিন্তু মুসলমান সমাজের চাওয়া-পাওয়া, তাঁদের সুখশান্তি কংগ্রেস খেয়াল রাখবে কিনা এই নিয়ে দেশের মুসলমানদের মনে তখন ক্রমেই সন্দেহ দানা বাঁধছিল। তাঁরা অনেকেই নিজেদের জন্য আলাদা দেশ বা রাজ্য চাইছিলেন, যেখানে সরকার চালাবেন মুসলমান সমাজের মানুষরাই। এইসব কথাই আলোচনা হয় লাহোরের সভায়।

১৯৪০ সালেও কিন্তু বোঝা যায়নি যে আর মাত্র সাত বছরের মধ্যেই ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাবেন, আর দু’ভাগ হবে এই দেশ। বরং কোনও কোনও ইতিহাসবিদ বলেন যে জিন্নাহ আলাদা দেশের কথা অনেকবার বললেও আসলে কংগ্রেসের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে দেশ

চালানোর কথাই ভেবেছিলেন। ওঁর ইচ্ছা ছিল যে, স্বাধীন ভারতে রাজ্যের হাতে থাকবে বেশি ক্ষমতা, মুসলমান প্রধান রাজ্যগুলিতে সরকারে থাকবে মুসলিম লীগ, আর দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু দেশের টাকাপয়সা, সেনাবাহিনী আর অন্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব থাকবে। কিন্তু কংগ্রেস এই ক্ষমতা ভাগাভাগিতে রাজি না হওয়ায় শেষমেশ দু'টুকরো হয় ব্রিটিশ ভারত।

অবশ্য অন্য মতও আছে। অনেকেই বলেন যে জিন্নাহর ক্ষমতার লোভ এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দিন-দিন সম্পর্ক খারাপ হওয়ার ফলেই দেশভাগ হয়েছিল। একথা সত্যি যে, ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাস থেকে দেশের নানা জায়গায় সাংঘাতিক মারামারি শুরু হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান-শিখদের মধ্যে। সে লড়াই আর থামেই না যেন! থামবে কী করে, দেশের ব্রিটিশ সরকার যদি চেষ্টাই না করে! কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই লড়াই সব আলোচনাকে একরকম থামিয়ে দিল। দেশভাগ হলেই শান্তি আসবে, এরকম ধারণা পাকাপোক্ত হল দেশের বহু মানুষের মধ্যে। আর তখন ব্রিটিশদের ভারত ছাড়ার বেজায় তাড়া। তাঁরা চলে গেলে দেশে ক্ষমতা কে পাবে, কী শর্তে, কতদিনের জন্য – এইসব জটিল প্রশ্নের উত্তর ছিল না ব্রিটিশদের কাছে। দেশকে দু'টুকরো করে দুই দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার মধ্যে সহজ সমাধান খুঁজেছিল ব্রিটিশ সরকার। তাই দেখতে দেখতে এক বছরের মধ্যেই ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি

হয়ে গেল দুটো দেশ। জন্ম নিল পাকিস্তান, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি, আর ভারত, যেখানে সংখ্যায় বেশি হিন্দুরা। সবাই যে এই ভাগাভাগি খুশিমনে মেনে নিয়েছিলেন তা নয়। গান্ধীজিই যেমন খুব দুঃখ পেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান, ভারত-পাকিস্তান ভাগাভাগিতে। ১৫ই আগস্ট যখন দেশজুড়ে স্বাধীনতার আনন্দ উৎসব চলছে, কলকাতা শহরের একটা বাড়িতে না খেয়ে, কারও সঙ্গে কথা না বলে সারাটা দিন কাটিয়েছিলেন তিনি।

আরো একটা কথা এখানে বলা দরকার। পাকিস্তানে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে, অনেক হিন্দু রয়ে গিয়েছিলেন আর ভারতেও থেকে গিয়েছিলেন বহু মুসলমান। দেশভাগের পরপর পশ্চিম বাংলায় প্রতি ১০০ জন লোকের মধ্যে ২৫ জনই ছিলেন মুসলমান আর পূর্ব বাংলায় ২৮.২ শতাংশ মানুষ ছিলেন হিন্দু। তাঁরা তাঁদের জন্মভূমিকে ভালবেসে, নিজেদের বাড়ি, পুকুর, প্রতিবেশীদের ভালবেসে রয়ে গিয়েছিলেন। কেউ আবার থেকে গিয়েছিলেন এই ভেবে যে ক'দিন পরেই ফের হয়তো জুড়ে যাবে এই দুই দেশ। অন্যদিকে বেশ কয়েকজন বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান নেতা দুই বাংলা এক করে একটা তিন নম্বর দেশ তৈরি করা যায় কিনা সেই নিয়েও আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন কিছুদিন। এইসব কথাবার্তা শুনেও অনেকেই থেকে গিয়েছিলেন নিজের নিজের বাড়িতে। বলা তো যায় না, আবার হয়তো পাল্টে গেল দুই বাংলার মানচিত্র। তাছাড়া দুই দেশের নেতারাই কিন্তু কথা দিয়েছিলেন যে হিন্দু, মুসলমান

সকলের ভালমন্দ দেখবেন তাঁরা। সে কথা কিন্তু কোনও দেশের নেতারাই রাখেননি—তাইতো আজও দুই দেশে ধর্মের নামে এত মারামারি ঝগড়া।

কবে কেমন করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি লাগল, সে কথা তো অনেক বলা হল। কিন্তু ইতিহাস তো আর শুধুই কবে, কী ঘটেছে তার ফর্দ নয়। ইতিহাস মানে কোনও পুরনো ঘটনাকে নানাভাবে বোঝার চেষ্টা করা। সেই ঘটনা কীভাবে ঘটল, কেন ঘটল, তার ফলে কী হল, এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করা। আমরাও তাই করি বরং। নেতারা দেশটাকে ভাগ করবেন ঠিক করার পর, হাতে-কলমে কী ভাবে ব্রিটিশ ভারত ভেঙে দুটো দেশ হল, এইবার সেই কথাটা বলি।

(২) ভাগাভাগির হিসাব নিকাশ

মালদহ জেলায় সেকালে অনেক বড় জমিদার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল ভারী রেষারেষি। কে কত বড় জমিদার, কার দাপট কত বেশি, তা মাপার একটা উপায় ছিল হাতিশালে তাঁর ক'টা হাতি। হাতি পোষার খরচ অনেক, ছোট জমিদারের সামর্থ্যের বাইরে। কিন্তু কে মেজো, কে সেজো, আর কে বড় জমিদার তা ঠিক হত তাঁর হাতির সংখ্যা দেখে। জমিদারদের সঙ্গে পাল্লা দিতে ব্রিটিশ সরকারও মালদহ জেলার আমলাদের ব্যবহারের জন্য হাতি পুষেছিল। জয়মণি ছিল তেমনই এক সরকারি হাতি। ভারী লক্ষ্মী ছিল সে। সময় সময় কয়েকটা কচি কলাগাছ চিবিয়ে খেতে পারলেই সে খুশি থাকত। আর বাচ্চাদের সঙ্গে ছিল তার বেজায় ভাব। কিন্তু এই জয়মণিকে নিয়েই দারুণ গোল বেঁধেছিল দেশভাগের সময়ে।

গল্পের শুরু ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন, ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে। সে দিন সকাল সকাল বড়লাট মাউন্টব্যাটনের বাড়িতে বসেছিল জরুরি মিটিং। সেই মিটিংয়ে হাজির ছিলেন কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের সব তাবড় নেতারা। নানা আলাপ-আলোচনা, কিঞ্চিৎ ঝগড়াঝাঁটির পর সেখানে ঠিক হয়েছিল যে ব্রিটিশ ভারত ভেঙে যদি দু'টি দেশ তৈরি করতেই হয়, তাহলে তার জন্য নানা প্রস্তুতি নিতে হবে। মিটিংয়ে সবাই কথাবার্তা বলে বুঝেছিলেন যে ভাঙব বললেই দেশ ভাঙা যায় না, সে এক জটিল ব্যাপার। কী সেই জটিলতা, আর তার কেমন প্রস্তুতি দরকার? একে একে বলি।

প্রথমত ঠাণ্ডা মাথায় মানচিত্র খুলে বসে ঠিক করতে হবে যে কোথায় ভারতের শেষ আর

কোথায় পাকিস্তানের শুরু। অর্থাৎ দুই দেশের মধ্যে টানতে হবে সীমারেখা। তারপর, যাঁরা সরকারি চাকুরে, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা-ও ঠিক করতে হবে। ব্রিটিশ সরকারের জায়গায় যদি ভারতীয় আর পাকিস্তানি সরকার তৈরি হয়, তাহলে কে কোন সরকারের হয়ে কাজ করবেন, তা ঠাওর করা দরকার। এছাড়া দু'দেশের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা দরকার সরকারি সম্পত্তিরও। সে এক জটিল হিসাবনিকাশের ব্যাপার। এবার প্রশ্ন উঠল যে এতসব কাজ কে করবে? সেই উত্তর মিলল মিটিংয়ের দিন দশেকের মধ্যে।

বিভিন্ন দফতরের কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি হল দশটি বিশেষজ্ঞ দল। তাঁদের কাজ ছিল দেশভাগের সব খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত করা। এই দশটি বিশেষজ্ঞ দলের মাথার উপর ছিল দুই সদস্যের আর একটি দল, যার পোশাকি নাম স্টিয়ারিং কমিটি বা পরিচালনা সংসদ। চৌধুরী মহম্মদ আলি আর হিরুভাই মুলজিভাই প্যাটেল নামে দুই পোড়খাওয়া আমলা ছিলেন স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য। হিরুভাই মুলজিভাই প্যাটেল পরে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন, আর চৌধুরী মহম্মদ আলি হয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তবে আমি যে সময়ের গল্প বলতে বসেছি, সেই সময়ে দু'জনের কেউই রাজনীতির মঞ্চে পা দেননি। তাঁদের দায়িত্ব ছিল বিশেষজ্ঞ দলগুলিকে সময়ে সময়ে পরামর্শ দেওয়া, এবং কোনও বিষয়ে এই দলগুলির সদস্যদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বাঁধলে তা মেটানোর চেষ্টা করা। এছাড়া এই দু'জনের মাধ্যমেই বিশেষজ্ঞ দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন লীগ ও কংগ্রেস নেতারা। যে কোনও

নেতা অবশ্য যোগাযোগ রাখতেন না। দুই দলেরই দু'জন করে নেতা নিয়ে তৈরি হয়েছিল পার্টিশন কাউন্সিল, আর তাঁদেরই দায়িত্ব ছিল পুরো প্রক্রিয়ার উপরে নজর রাখা, বিশেষজ্ঞ দল আর পরিচালনা সংসদের সঙ্গে দরকার-অদরকারে যোগাযোগ রাখা। এ তো গেল দিল্লির সরকারের কথা। এরপর বাংলা আর পঞ্জাবের নেতারাও ঠিক করলেন যে তাঁদের রাজ্যের খানিকটা পাবে পাকিস্তান, আর খানিকটা পাবে ভারত। তখন কলকাতা আর লাহোরেও সম্পত্তি এবং লোক-লস্কর ভাগের জন্য তৈরি হল একইরকম বড়, মেজো, সেজো সংসদ।

আগেই বলেছি, আমাদের জয়মণি ছিল সরকারি হাতি। আমলারা যখন একহাতে নোটবই আর অন্যহাতে পেনসিল নিয়ে সরকারি সম্পত্তির লিস্টি বানাতে বসলেন, তখন তাতে জয়মণিরও নাম উঠল। একগাদা খাতার পাতা আর পেনের কালি খরচ করে নানা অঙ্ক-টঙ্ক কষে কর্তারা বললেন যে জয়মণি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য। তখন প্রশ্ন উঠল জয়মণি পাকিস্তানে যাবে কী করে? তা আর এমন কী ব্যাপার, মালদহ থেকে তো দু'পা গেলেই দু'দেশের বর্ডার, আর তা পেরোলেই পূর্ব পাকিস্তান। মাহুতের সঙ্গে হেঁটে হেঁটেই দিব্যি নতুন দেশে চলে যাবে জয়মণি। কিন্তু বাদ সাধলেন স্বয়ং মাহুতমশাই। সীমানা পেরিয়ে পাকিস্তানে যেতে হবে শুনেই তাঁর গায়ে জ্বর এল। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে চাকরি করবেন, একথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বোধহয় ভয় হল যে একদিনের জন্যও পাকিস্তানে গেলে জয়মণির সঙ্গে তাঁকেও ওখানেই রেখে দেবে পূর্ব পাকিস্তান সরকার। এবার উপায় কী? জয়মণি তো

হাজার হোক একটা হাতি, সে কি আর একা একা পথ চিনে হেঁটে হেঁটে চলে যেতে পারে পাকিস্তানে! অগত্যা সকলের মাথায় হাত।

দেখতে দেখতে দেশভাগের পর কেটে গেল দশ মাস। চলে এল ১৯৪৮ সালের জুন মাস, কিন্তু তখনও জয়মণি মালদহে। পূর্ব পাকিস্তানের সরকার ততদিনে অধৈর্য হয়ে উঠেছে জয়মণির জন্য। অবশেষে সে দেশের বন দফতর থেকেই মালদহে পাঠানো হল দু'জন কর্মীকে, জয়মণিকে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু তাঁরা মালদহে আসতে না আসতেই হল এক নতুন বিপদ। মালদহ জেলার কালেক্টর এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে বললেন যে জয়মণিকে বিদেশ-বিভুঁইয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে ১৯০০ টাকা জমা করতে হবে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকেই জয়মণি কাগজে-কলমে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সম্পত্তি। কিন্তু দশ মাস ধরে জয়মণির খাবার জুগিয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আর হাতির খোরাক তো কম কথা না! শ'য়ে শ'য়ে সরকারি টাকা খরচ হয়েছে তাতে। সেইসব হিসাব কষেই কালেক্টরের এই দাবি। সে যুগে ১৯০০ টাকা মানে কিন্তু অনেক টাকা। জয়মণিকে যাঁরা নিতে এসেছিলেন তাঁদের কাছে অত টাকা ছিল না। কালেক্টরও নাছোড়বান্দা, এই টাকা তাঁর চাই-ই চাই। রেগেমেগে তিনি জেলেই পুরে দিলেন ওপার বাংলা থেকে আসা এই দু'টি মানুষকে। জয়মণিকে নিয়ে ফেরা তো দূরের কথা, এই মানুষ দুটি সরকারি নির্দেশে ভারতে পৌঁছে কী হয়রানটাই না হলেন। জয়মণির বিদেশযাত্রাও আবার গেল আটকে। কোনও দিনই বোধহয় জয়মণির আর পাকিস্তান যাওয়া হয়নি।

জয়মণিকে নিয়ে যেমন টানাহেঁচড়া, ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল দুই বাংলা আর দুই দেশের মধ্যে, তেমনই আরও নানা ছোট-বড় সম্পত্তি নিয়ে ভারত আর পাকিস্তানের নিত্যদিন ঝামেলা লেগেই ছিল। একটা দেশকে দু'টুকরো করা কি আর চাট্টিখানি কথা? কত হিসাবনিকাশ, আলাপ-আলোচনা আর তর্কাতর্কির মধ্যে দিয়েই আস্তে আস্তে ব্রিটিশ ভারতের গিঁট খুলে তৈরি হচ্ছিল দু'টি দেশ। হচ্ছিলই বা বলি কী করে? আজও তো কাগজ খুললেই আমরা পড়ি যে কাশ্মীর নিয়ে কি ভীষণ টানাটানিটাই না হয়ে চলেছে দুই দেশে! আচ্ছা, দেশভাগ কি তাহলে শুধুই পুরনো দিনের একটা ঘটনা, না কি আজও ঘটে চলেছে দেশভাগ? মাথায় রাখি আমরা এই প্রশ্নটা, হয়তো এই বইতেই খুঁজে পাব এর উত্তরও।

(৩) র‍্যাডক্লিফ সাহেবের ছুরি

কাশ্মীরের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল, কলকাতা শহর নিয়েও খানিক দড়ি-টানাটানি হয় ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে। আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে ব্রিটিশদের হাত ধরে গড়ে ওঠে কলকাতা শহর। গঙ্গার ধারে তৈরি হওয়া এই শহর ছিল ব্রিটিশ ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য, রাজনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির এক বিরাট কেন্দ্র। দূর-দূরান্ত থেকে লোকে কলকাতায় আসতেন লেখাপড়া বা চাকরি করতে, কেউ আসতেন কাজের খোঁজে। নানা ধর্মের, নানা ভাষার মানুষের ভিড়ে জমজমাট হয়ে থাকত কলকাতার রাস্তা-ঘাট, অলিগলি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের কথা উঠতেই চলে এল বাংলা ভাগের কথা, আর শুরু হল কলকাতা নিয়ে টানাটানি। খুলে বলি গল্পটা।

দেশভাগের সময়ে বাংলা আর পঞ্জাবের নেতারা ঠিক করেছিলেন আধাআধি হবে তাঁদের রাজ্য দু'টিও। এক আধলা পাবে পাকিস্তান, আর অন্য আধলা রয়ে যাবে ভারতে। তেমনই ঠিক হল অসমেরও এক টুকরো যাবে পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু এবার নানা প্রশ্ন উঠল। কে দায়িত্ব নিয়ে, মানচিত্র দেখে ঠিক করবে কোথা দিয়ে যাবে এই সীমারেখা? কিসের ভিত্তিতেই বা ঠিক হবে কোন গ্রাম, কোন শহর আর কোন জেলা যাবে পাকিস্তানে, আর কোনটা পড়বে ভারতে? নেহরু, জিন্নাহ আর বড়লাট মাউন্টব্যাটন নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে ডেকে পাঠালেন এক সাহেবকে। নাম তাঁর সিরিল র‍্যাডক্লিফ, পেশায় তিনি আইনবিশারদ।

র‍্যাডক্লিফ কিন্তু আগে কখনও ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেননি, আর না ছিল তাঁর এই দেশটা নিয়ে কোনও লেখাপড়া বা আগ্রহ। সেই কারণেই বোধহয় তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন বড়লাট, নেহরু আর জিন্নাহ। যে মানুষটা ভারত-পাকিস্তান নিয়ে বিন্দুবিসর্গ জানেন না, এবং পেশায় বিচারক, তিনি দুই দিকের দাবিদাওয়া মাথায় রেখে উচিত ভাবে দেশ ভাঙবেন, এই ছিল নেতাদের বিশ্বাস।

র‍্যাডক্লিফকে মাথায় বসিয়ে ১৯৪৭-এর ৩০শে জুন তৈরি হল দুটো সীমানা কমিশন। একটার দায়িত্ব ছিল ভারত আর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে দাগ টানা। আর অন্যটার কাজ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে গণ্ডি কাটা। কমিশন দুটির হাতে ছিল দেড় মাস মতো সময়। এই দুই কমিশনেই ছিলেন আরও চারজন করে লোক, সবাই আইন বিশারদ। তাঁদের মধ্যে অর্ধেক হিন্দু, যাঁদের নাম বেছেছিল মূলত কংগ্রেস। আর বাকি অর্ধেক মুসলমান, লীগের পছন্দের মানুষ। তাঁদের বলা হয়েছিল এমনভাবে সীমানা টানতে যাতে পাকিস্তানের দুই অংশ — পূর্ব আর পশ্চিম — হয় মুসলমান-প্রধান। পাশাপাশি মাথায় রাখতে বলা হয়েছিল ‘অন্যান্য বিষয়কেও’। এই অন্যান্য বিষয় যে কী, তা কিন্তু বড়লাট স্পষ্ট করে বলেননি। আর এই নিয়ে বাঁধল নানা গোলযোগ। কলকাতা নিয়ে শুরু হল টানাটানি। এইখানে বলে রাখি যে দাগ-টানাটানিটা কিন্তু তাঁরা মাঠে নেমে হাতে-কলমে করেননি। মানচিত্রে পেনসিল দিয়ে আঁচড় কেটে ঠিক করেছিলেন তাঁরা ভারত-পাকিস্তানের সীমানা।

ব্রিটিশ সরকারের আমল থেকেই দশ বছরে একবার সারা দেশের লোক গোনা হত। সেই হিসাব অনুসারে কলকাতায় হিন্দু মানুষের সংখ্যা, মুসলমান মানুষের তুলনায় ছিল সামান্য বেশি। তবে এ শহরে ছিলেন বহু মুসলমান ছাত্র, যাঁরা দূরের গ্রাম থেকে আসতেন পড়াশোনার জন্য। তেমনই ছিলেন উত্তর ভারত, বিহার থেকে আসা মুসলমান শ্রমিক যাঁরা কাজ করতেন চটকলে বা অন্য কোথাও। কলকাতা বন্দরে কাজ করতেন সিলেট জেলার মুসলমান সারেংরা। অর্থাৎ এই শহরে পাকাপাকি ভাবে থাকা মানুষের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা খানিক বেশি হলেও, শহরটা যতটা ছিল তাঁদের ততটাই তাঁদের মুসলমান বন্ধু-বান্ধবদের। সবসময়ে কলকাতার হিন্দু-মুসলমানে ভাব-ভালবাসা ছিল, তা নয় অবশ্য। স্বাধীনতার ঠিক এক বছর আগে যেমন এই শহরেই তাঁদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গাও হয়েছিল।

লীগ চাইল হিন্দু-মুসলমান দুইয়ের শহর কলকাতা থাকুক পূর্ব পাকিস্তানে। আর কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা (আর একটা বড় দল) চাইল এই শহর হোক ভারতের অংশ। একদল বললেন যে পাকাপাকিভাবে থাকেন এমন মানুষের মাথা গুনলে কলকাতা হিন্দু শহর, তাই তার ভারতেই থাকার কথা। অন্যদল বললেন, তাতে কী, হিসাবে আনা হোক বাইরে থেকে আসা মানুষকেও। একদল বললেন, কলকাতা পুরসভা যা কর আদায় করে, তার সিংহভাগ আসে হিন্দুদের পকেট থেকে, তাই এ শহর হিন্দুদের। অন্যদল তেড়ে উঠে বললেন, আর কলকাতা বন্দর যে বছরে কোটি কোটি টাকা পায় পূর্ব বাংলার পাট বিদেশে পাঠিয়ে, তার বেলা?

মাঝে মিনমিন করে মুসলিম লীগের সুহরাবর্দি সাহেব একবার বলেছিলেন, আপাতত না হয় কলকাতা দুই বাংলারই থাক, এখান থেকেই চালানো হোক পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিমবঙ্গের রাজপাট। তাতে অবশ্য বাকিরা কেউই রাজি হননি। শেষ কথা বললেন র‍্যাডক্লিফ। ১৭ই আগস্ট সীমানা কমিশন সবাইকে জানাল তাঁরা কিভাবে কোথা দিয়ে দাগ টেনে ভারত থেকে আলাদা করেছে পশ্চিম আর পূর্ব পাকিস্তানকে। দেখা গেল কলকাতা রয়েছে পশ্চিম বাংলায়, মানে ভারতে।

কলকাতা নিয়ে লড়াইটা র‍্যাডক্লিফের কথায় মিটে গেলেও অন্য নানা জায়গা নিয়ে লম্বা সময় ধরে দু'দেশের মধ্যে চলেছিল ঝগড়াঝাঁটি, আলাপ-আলোচনা। আসলে র‍্যাডক্লিফের দাগে ছিল নানা গরমিল। পদ্মা, মাথাভাঙ্গা, ইছামতী এবং আরও নানা নদ-নদীকে অনেক জায়গায় ভারত আর পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন র‍্যাডক্লিফ। কিন্তু বাংলার নদীরা খামখেয়ালি, মাঝেমাঝেই পাল্টায় তাদের চলার পথ। তখন কি ভারত-পাকিস্তানের সীমানাও পাল্টে যাবে? অসমের নদী কুশিয়ারাকে নিয়েও চলেছিল একই রকম ঝামেলা। লড়াই বেঁধেছিল অসমের জঙ্গল পাথারিয়া নিয়েও। এই সব লড়াই বিবাদ চলেছিল বছরের পর বছর। কাশ্মীরে যেমন এখনও মেটেনি সেই লড়াই। আর এই ঝগড়া-বিবাদে বিপদে পড়তেন সেইসব মানুষ, যাঁদের ঘরবাড়ি, চাষের ক্ষেতের কান ঘেঁষে ছুরি চালিয়েছিলেন র‍্যাডক্লিফ।

দেশভাগের ফলে আরও কতরকম বিপদেই না পড়েছিলেন তোমার আমার মতো সাধারণ

মানুষ। নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে নতুন দেশে এসে নানা কষ্টে দিন কাটিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ লোক। আবার সেই কষ্টের মধ্যেই কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছিলেন নতুনভাবে বাঁচার সুযোগ। এই পাওয়া না-পাওয়ার গল্পের ঝুলিটা খুলে বসি এইবার।

(৪) ভাত, রুটি, ছেড়ে আসা দেশ

যখন ব্রিটিশ ভারত ভাগ হল, দেশরাজের আর কতই বা বয়স, এই ধরো ১২-১৪ বছর। সে তখন ক্লাস সেভেন-এ পড়ে, পঞ্জাবের এক গ্রামে। সেই গ্রামেই তার বাপ-ঠাকুর্দাও থেকেছেন সারা জীবন। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ সাহেবের হিসাবে তাদের সেই গ্রাম গিয়ে পড়ল পাকিস্তানে। ওদিকে সে বছর গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্জাব জুড়ে বেজায় গণ্ডগোল বেঁধেছিল। ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাবে, দেশভাগ হবে, আর সঙ্গে সঙ্গেই আধাআধি হবে পঞ্জাবও — এই সব খবর আর তার সঙ্গে নানা গুজব ভারী অস্থির করে তুলেছিল সেখানকার মানুষকে। বহু যুগ ধরে পাশাপাশি থেকেও হঠাৎ হিন্দু, শিখ, মুসলমানে গিয়েছিল লড়াই বেঁধে। সেই লড়াই যখন পুলিশ, মিলিটারি কেউই থামাতে পারছে না তখন জিন্নাহ আর নেহরু মিলে এক বিচিত্র সমাধান বের করলেন। ঠিক হল যে পঞ্জাবের যে শহর আর গ্রামগুলি গিয়ে পড়েছে পাকিস্তানে, সেখান থেকে হিন্দু আর শিখ পরিবারকে নিয়ে আসা হবে ভারতে। আর ভারতের মধ্যে পঞ্জাবের যে আধখানা অংশ, তা থেকে মুসলমানদের নিয়ে যাওয়া হবে পাকিস্তানে। দু'দেশের সেনা বাহিনী একসাথে মিলে এই লোক পারাপারের বন্দোবস্ত করবে। দুই বাংলার মধ্যে কিন্তু বোঝাপড়া করে এমন লোক পাল্টাপাল্টি হয়নি। একটু পরেই আসছি সে কথায়।

নেহরু আর জিন্নাহর কথামতো দেশরাজের ছোট্ট গ্রামে পৌঁছল পুলিশ, মিলিটারি। ২৫শে

আগস্ট কাকভোরে, ঘুম চোখে দেশরাজ তার মা-দাদাদের হাত ধরে পুলিশের পিছন পিছন ভারতের পথে রওনা দিল। আশেপাশের গ্রাম থেকেও শ'য়ে শ'য়ে মানুষ এসে যোগ দিলেন তাদের সঙ্গে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের বিরাট সেই মিছিল, সঙ্গে তাঁদের গরু, মোষ, বোঁচকাবুঁচকি, বাসনকোসন। চার দিন পায়ে হেঁটে এসে তাঁরা পৌঁছলেন ফাজিলকা বলে একটা শহরে। এই শহরের গা ঘেঁষে গেছে র‍্যাডক্লিফের লাইন আর এই ফাজিলকা পড়েছে ভারতের ভিতর।

ভারতে তো না হয় পৌঁছনো গেল, কিন্তু তারপর? এ দেশে না ছিল দেশরাজদের কোনও বন্ধু, না কোনও আত্মীয়। দেশরাজের মা আর দাদা কয়েকজনের কাছে শুনলেন যে, উত্তরপ্রদেশের সাহরানপুরে গেলে কাজকর্ম, বাড়ি-ঘর পাওয়া যাবে মোটের উপর সহজে। তাই ঠিক হল। ট্রেনে চেপে বসল দেশরাজ, সঙ্গে তার বাড়ির লোক। কিন্তু তাদের কপাল বড়ই খারাপ। ট্রেন একটু এগোতেই রাস্তায় ভীষণ বর্ষা নামল, বন্ধ হল গাড়ি। সেপ্টেম্বর মাস, বর্ষাকাল, আর তার মধ্যেই চলেছে দেশ ভাগাভাগি। মানুষের যেন বিপদের আর শেষ নেই। বৃষ্টি মাথায় পঞ্জাবের আম্বালা স্টেশনেই দেশরাজের কাটল বেশ কয়েক রাত। তারপর হঠাৎই একটা মালগাড়ি এসে দাঁড়াল স্টেশনে। দেশরাজদের মতো পাকিস্তান থেকে যাঁরা এসে স্টেশনে আছেন, তাঁদের দিল্লি নিয়ে পৌঁছে দিতে পারে এই গাড়ি। তাতেই চেপে বসলেন দেশরাজের বাড়ির লোক।

তাঁদের কাছে দিল্লিই বা কি, সাহ্‌রানপুরই বা কি, সবই অচেনা। রানাঘাট হয়ে তিব্বত যাওয়ার মতো!

টিকির টিকির করে মালগাড়ি একসময় পৌঁছল দিল্লি। স্টেশনেই ঠাঁই হল আবার দেশরাজদের। সরকারি বাবুরা এলেন, বললেন যে কয়েকদিনেই ভাল ব্যবস্থা হবে থাকা-খাওয়ার, কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করতে হবে দিল্লি স্টেশনেই। দিল্লি স্টেশন থেকে দু'পা এগোলেই ছিল ওয়াবেল ক্যান্টিন। সেখানেই ঘরছাড়া মানুষগুলোর খাওয়ার ব্যবস্থা হল আপাতত। সেই ক্যান্টিনে সারাদিন বড় বড় ডেকচিতে ভাত ফুটত, আর গামলায় থাকত গরম ডাল। সকাল, দুপুর, বিকেল যে কোনও সময় গেলেই হল, দু'মুঠো ভাত আর এক হাতা ডাল জুটে যেত সবার। কিন্তু দেশরাজরা তো পঞ্জাবের মানুষ, গমের ক্ষেতে ঘেরা তাদের গ্রাম, আটার রুটির অভ্যাস। দিনের পর দিন কি আর ভাত মুখে রোচে? দিন সাতেক এভাবে কাটানোর পর দেশরাজের বাড়ির লোক হঠাৎ শুনলেন যে ঝাঁসিতে গেলে এ সমস্যা মিটবে। সেখানে তাদের মত পাকিস্তান থেকে আসা মানুষদের সরকার দু-বেলা রুটি দিচ্ছেন নাকি। শোনামাত্রই আবার একটা ট্রেনে চেপে বসল দেশরাজরা। এবার লক্ষ্য মধ্যপ্রদেশের ঝাঁসি।

তোমরা হয়তো ভাবছ, এত দাঙ্গা দুর্যোগের মধ্যে দু'বেলা দু'মুঠো গরম ভাত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে কোথায় খুশি হবে এই মানুষগুলো, তা না, আবার চলল রুটির খোঁজে! কিন্তু মানুষ

এমনই। যখন পৃথিবী ওলটপালট হয়ে যায়, রোজকার জীবন একদম পালটে যায়, তখন একটা চেনা খাবার, অনেকদিনের পুরনো খেলনা, রোজকার বাড়ির পরা জামা বা উঠোনের নিমগাছের মধ্যেই সে যেন একটা খুঁটি খুঁজে পায়। সব পাল্টে গেলেও একটা দুটো জিনিস যে আগের মতোই আছে, এই ভাবনার মধ্যে ভারী শান্তি পায় সে। তবে ঝাঁসিতেও কিন্তু বেচারা দেশরাজদের শান্তি হয়নি। খবরটা সত্যিই ছিল। ঝাঁসিতে সরকারি শিবিরে ছিল রুটির ব্যবস্থা। কিন্তু হায়রে! এ যে বজরার মোটা রুটি, আটার রুটি নয়! এর চেয়ে তো দিল্লিই ভাল ছিল। দেশের রাজধানী বলে কথা, কত কাজের সুযোগ। অগত্যা, ঝাঁসিতে দু'তিন দিন কাটিয়ে আবার দেশরাজরা রওনা হল দিল্লির পথে। দেশভাগ আর দুটো গরম গরম আটার রুটির খোঁজে পথেই কেটে গেল তাদের কয়েক মাস। অবশেষে সেই বছর শীতে দিল্লির এক শিবিরে ঠাঁই মিলেছিল দেশরাজের, আর সেখানে উনুনে তারা নিজেরাই সেঁকে নিতে পেরেছিল আটার রুটি। সেই রুটির মধ্যেই হয়তো খুঁজে পেয়েছিল দেশরাজ তার পঞ্জাবের ছেড়ে আসা গ্রামের একফোঁটা!

ভাত-রুটির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল চাষি করিম নাসিরের কথা। তাঁর পরিবারের বহুদিনের বাস অসমে, পেশা তাঁদের ধান চাষ। দেশভাগের বহু বছর আগে নাসিরের বাপ-ঠাকুর্দা ময়মনসিংহ ছেড়ে অসমে পাড়ি দিয়েছিলেন চাষবাসের জমির খোঁজে। তার আগে

পরে আরও অনেক বাঙালি মুসলমান চাষি-পরিবার গিয়েছিল অসমে। তাদের কখনও ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল বন্যা, কখনও বা দারিদ্র। অসমে মুসলিম লীগ দলটার প্রতিপত্তি ছিল ভালই। তাঁরা সাহায্য করেছিলেন আর উৎসাহ দিয়েছিলেন নাসির আর তাঁর মতো অনেক বাঙালি মুসলমান চাষিকে, অসমে থেকে যাওয়ার জন্য। অসমে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়লে তাঁদের দল ভারী হবে, ভোটে জিততে সুবিধা হবে, এইসব ভেবেছিলেন লীগের নেতারা। নাসিরদের অবশ্য পছন্দ করতেন না অসমের কংগ্রেস নেতারা আর সেই রাজ্যের অসমীয়া হিন্দুরা। তাঁরা মনে করতেন যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন নাসিররা, অনেক জমি দখল করে নিয়েছেন তাঁরা, ফলে সুযোগ সুবিধা কমে যাচ্ছে অসমের আদি বাসিন্দাদের। ভোটের অঙ্কেও কংগ্রেসের কোনো লাভ ছিল না। মুসলমান চাষি মুসলিম লীগকে ভোট দেবে ধরেই নিয়েছিলেন তাঁরা।

এসবের মধ্যেই ভাগ হল দেশ। আরও জটিল হল নাসিরদের জীবন। অসম এল ভারতে, কিন্তু ময়মনসিংহ গেল পূর্ব পাকিস্তানে। অসমের বহু দশকের বাসিন্দা নাসির হলেন ভারতীয়। কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষের দেশ ময়মনসিংহ হয়ে গেল বিদেশ। দেশভাগের পরপর অসম জুড়ে হিড়িক উঠল 'বিদেশি হটাও।' বিদেশি কারা? বাঙালি মুসলমান চাষি দেখলেই অসমীয়া পুলিশের সন্দেহ হত যে নিশ্চয়ই সে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা বিদেশি। হিন্দু হলে অবশ্য অন্য কথা। দেশভাগ আর দাঙ্গায় ঘর ছাড়া হয়ে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে অসমে এলে বিদেশী বলা হত

না সেই সময়ে। স্বাধীনতার পরপরই অসমের কংগ্রেস সরকার আইন করে পুলিশকে বললেন বিদেশিদের ঠেলে পাঠিয়ে দিতে পাকিস্তানে। হাজার হাজার বাঙালি মুসলমান চাষি দেশছাড়া হলেন। অসমে পড়ে রইল তাঁদের মাইলের পর মাইল ধানের ক্ষেত।

নাসির অবশ্য আরও বেশ কয়েক বছর থাকতে পেরেছিলেন অসমে। তাঁর নামে শমন এল ১৯৬৪ সালে। পুলিশ একদিন আচমকা বললেন যে নাসির আসলে পাকিস্তানি। নাসির বারবার বললেন যে তাঁর পরিবার অসমে রয়েছে দেশভাগের বহু বছর আগে থেকে, যখন পাকিস্তান বলে কিছুই ছিল না। তবু কেউ শুনল না তাঁর কথা। রাতারাতি চেনা গ্রাম, নিজের ক্ষেত ছেড়ে নাসিরকে চলে যেতে হল সীমান্তের অন্য দিকে, ময়মনসিংহে। মন অবশ্য তাঁর পড়ে রইল অসমে। বহুদিন অবধি তাঁকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, নাসির বলতেন যে তিনি ভারতীয়ও নন, পাকিস্তানিও নন — তিনি অসমীয়া। অসমের মাটিই তাঁর দেশ। ভারত-পাকিস্তানের বড় পরিচয়ের হিসাবে তাঁর আগ্রহ ছিল না। তেমনই হিন্দু-মুসলমানি পরিচয়ের অঙ্কেও ছিল না তাঁর মাথা ব্যাথা। এই পরিচয়ের লড়াইয়ের মাঝে পড়েই তো নাসিরকে তাঁর অসমের বাড়ি আর তাঁর সাধের ধান ক্ষেত ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল ময়মনসিংহে। মাঝে মাঝে তিনি হেঁটে হেঁটে চলে যেতেন দু'দেশের সীমানা পর্যন্ত; অসমের ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে চোখ ভিজে আসত তাঁর। ধানের গন্ধে মনে পড়ে যেত দেশ ছাড়ার ভীষণ দুঃখ।

অসমে কিন্তু আজও কে বিদেশি আর কে দেশি, এই তর্ক শেষ হয়নি। মাঝে মাঝেই ধরে-বেঁধে বিদেশি সন্দেহে গরিব মানুষকে নিয়ে যায় অসম সরকারের আমলা-পুলিশরা। এই গরিব মানুষদের মধ্যে এখন হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের লোকই আছেন। তবে সে সব কথা তোমরা জানতে পারবে পরের দুটো বইতে। আমরা বরং দেশভাগের অন্য কিছু গল্প পড়ি। পঞ্জাব, অসমের কথা হল। চোখ রাখি বাংলায়।

হাট
বাজার

(৫) বীথি দিদিমণির কথা

বীথির কথাই বলি। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ময়মনসিংহের এক বড় জমিদার বাড়িতে তার জন্ম। বিরাট ছিল তাদের বাড়ি, অনেক জায়গা-জমি। বীথি ছিল বাড়ির বড় মেয়ে, তার অনেকগুলো ভাইবোন। ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ভালই কাটত বীথির দিনগুলো। কাছেই ছিল ইস্কুল, পড়াশুনো চলত দিব্যি। কিন্তু দেশভাগের সময়ে ওলটপালট হয়ে গেল বীথিদের জীবন। সেই গল্পই বলতে বসেছি তোমাদের।

১৯৪৬ সালে যখন কলকাতা, নোয়াখালি, বিহারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভীষণ মারপিট, তখন বীথিদের গ্রামেও ছড়াল নানা গুজব আর দাঙ্গার ভয়। বন্ধ হল বীথির ইস্কুলে যাওয়া, যখন খুশি পাড়া-বেড়ানো, পাছে দুষ্টু মুসলমান ধরে নিয়ে যায়! মুসলমান বাড়িতেও ছিল সেই একই ভয় — তাঁদের মেয়েদের যদি হিন্দু ছেলেরা নিয়ে যায়! মেয়েদের নিয়েই যত ভাবনা সবার। একে তো তারা লড়াই করে দুষ্টু গুন্ডাদের সঙ্গে পেরে উঠবে কিনা কে জানে, তার উপর হিন্দু মেয়েকে মুসলমান গুন্ডা বা মুসলমান মেয়েকে হিন্দু গুন্ডা ধরে নিয়ে গেলে বাড়ির মান-সম্মান সব যাবে, সে ভয়ও ছিল সকলের। আমাদের সমাজ চিরকালই ভারী একচোখা। মেয়েদের বেলায় যত নিয়মকানুন, চোখ রাঙানি। বাড়ি, পাড়া, সমাজ সবার মান-সম্মান

বাঁচানোর সব দায়িত্বই যেন মেয়েদের, আর ছেলেদের সাত খুন মাফ। আর একথাও সত্যি যে এই দাঙ্গা, মারপিটের সময়ে এক ধর্মের মেয়েদের উপর অন্য ধর্মের ছেলেরা সুযোগ পেলেই নানারকম জোরজুলুম করেছিল। বাড়ির লোক ভয় তো পাবেনই! বীথির বাড়ির লোকেদেরও তাই যত চিন্তা সবই ছিল বীথি আর পরিবারের অন্য মেয়েদের নিয়ে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাই তাঁরা বীথিকে পাঠিয়ে দিলেন সুদূর কলকাতা শহরে, তাঁর মামার কাছে। পাল্টে গেল বীথির রোজকার জীবন।

সেবার কলকাতায় বীথি ছিল অল্প কিছু মাস। গ্রামের বাড়ি থেকে খবর এল যে তার জ্যাঠামশাই ভারী অসুস্থ। ময়মনসিংহে ফিরে গেল বীথি। কলকাতা মোটে ভাল লাগেনি তার। গ্রামে ফিরে বীথি ভেবেছিল কলকাতায় আর যাবে না সে। যখন স্বাধীনতা এল আর ভারত ভাগ হল, বীথি তখন ময়মনসিংহে। তাদের গ্রাম তখন মোটের উপর শান্ত। শুধু তাদের গ্রাম নয়, দুই বাংলাতেই তখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেশ কম। পাকিস্তান আর ভারতের নেতারা তাই বললেন যে পঞ্জাবে মারামারি হচ্ছে, হিন্দু-মুসলমানের দেশ বদল হচ্ছে হোক, বাংলায় তার দরকার নেই। নেহরু আর জিন্নাহ বললেন যে দুই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে থাক, কেউ যেন ঘর-বাড়ি ছেড়ে নতুন সীমানার অন্যদিকে না যান। অনেকের মতোই বীথিরাও তখন রয়ে

গেল নিজেদের গ্রামে। কিন্তু ১৯৫০ সালে আবার কলকাতায় যেতে হয়েছিল তাকে, এবার পাকাপাকি ভাবে, বাড়ির সকলের সঙ্গে।

কী এমন হল ১৯৫০ সালে? তার উত্তর খুঁজতে আমাদের আর একটু পিছিয়ে যেতে হবে। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আবার শুরু হয়েছিল খুব মারপিট। গণ্ডগোল বেঁধেছিল পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলার এক গ্রামে। খুব তাড়াতাড়ি তা ছড়িয়ে পড়েছিল দুই বাংলা আর অসমের নানা জায়গায়। পূর্ব বাংলা থেকে ১৫ লাখের বেশি হিন্দু তখন প্রাণ হাতে নিয়ে পালালেন পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে। উল্টো পথে ভারত ছেড়ে পূর্ব বাংলায় গেলেন প্রায় ৫ লাখ মুসলমান। এই সব মানুষ বুঝলেন দেশভাগ ১৯৪৭ সালে শেষ হয়নি। বরং ১৯৪৯-১৯৫০ সালে নতুন করে তাঁরা দেশ ভাগাভাগির মানে টের পেলেন। বীথি, তার মা-বাবা, ভাই-বোনের সঙ্গে আবার এসে উঠল কলকাতায়। ভর্তি হল এই শহরের এক ইস্কুলে। বাড়ি ভাড়া নিল শহরে।

কলকাতায় এসে ভারী দুর্দশায় পড়ল বীথিরা। তার বাবার হল কঠিন অসুখ, শেষ হয়ে এল সব জমানো টাকা। বীথির ভাই-বোনেরা ছোট ছোট। বীথিরা তখন আর একটা বাড়িতে উঠে এল টাকা বাঁচাতে। বাড়ি অবশ্য সেটা ছিল না, ছিল একটা গোয়ালঘর। না ছিল জল, না কোনও

জানালা। ঘুপচি ঘরে, আধপেটা খেয়ে বীথি কিন্তু পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিল। আর তার কলেজে পড়া শেষ হতেই সে দিদিমণির চাকরি নিয়েছিল একটা ইস্কুলে। বাড়ির সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল নিজের উপর।

দেশভাগ না হলে বোধহয় বীথির জীবন একদম অন্যরকম হত। শুধু বীথি কেন, আরও বহু মেয়ের জীবনই হত একদম আলাদা। দেশভাগের আগে খুব কম মেয়েরাই চাকরি করতেন। তখন ভাবা হত যে চাকরি ছেলেদের কাজ, আর মেয়েদের কাজ হল সংসার সামলানো। কিন্তু এই ভাবনাটাকেই এক্কেবারে পালটে দিল দেশভাগ। নতুন দেশে এসে যখন টাকা-পয়সার দারুণ অসুবিধা, নুন আনতে পান্তা ফুরায় বহু ঘরে, তখন সবাই বুঝলেন যে বাড়ির মেয়েদেরও চাকরি করা দরকার। তাই খুব অভাবেও মেয়েদের লেখাপড়ায় জোর দিয়েছিলেন পূর্ব বাংলা থেকে আসা বাড়ির বড়রা। তারপর এই মেয়েরাই হাসপাতালের নার্স, ইস্কুলের দিদিমণি, টেলিফোন অফিসের কেরানি হয়ে হাল ধরেছিলেন বাড়ির।

হাজার অসুবিধা, দুঃখের মধ্যেও দেশভাগ কিন্তু বীথির মতো মেয়েদের জীবনে একটুকরো রোদ্দুর নিয়ে হাজির হয়েছিল। দেশভাগই একভাবে দেখতে গেলে বহু মেয়েকে গ্রাম থেকে শহরে, বা বাড়ির অন্দরমহল থেকে আপিস-কাছারিতে পৌঁছে দিয়েছিল। ছেলেতে-মেয়েতে

যে তফাৎ নেই, সকলেই চাকরি করতে পারে, পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারে, লেখাপড়ায় একইরকম ভাল হতে পারে, তা বীথির মতো বাড়িতে দেশভাগ না হলে বোধহয় কেউ বুঝতেই পারতেন না।

(৬) সাগর পাড়ি

ভারতের পশ্চিমে রয়েছে আরব সাগর, পুব দিকে বঙ্গোপসাগর। আর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। এই বঙ্গোপসাগরে রয়েছে এক গোছা দ্বীপ। তাঁদের এক সঙ্গে বলা হয় আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এই সব দ্বীপ নিয়ে আছে নানা গল্প, গুজব। দারুণ জঙ্গল নাকি এখানে, নানা হিংস্র মানুষের বাস, আর রয়েছে সাঙ্ঘাতিক সব জন্তু-জানোয়ার। তোমরা কেউ কেউ হয়তো বেড়াতেও গিয়েছ আন্দামানে, দেখেছ আসলে কেমন অপূর্ব সুন্দর সেই জায়গা। সেখানে আছে নীল সমুদ্র, ঝকঝকে আকাশ, জঙ্গল, পাহাড়। আর ইতিহাস বইয়ের পাতায় হয়তো পড়েছ আন্দামানের সেলুলার জেলের কথা। এখানে ব্রিটিশ আমলে বন্দী করে রাখা হত বড় বড় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। কিন্তু তোমরা কি জানো যে এই দ্বীপগুলোর কয়েকটার ইতিহাস জড়িয়ে আছে দেশভাগের ইতিহাসের সঙ্গে?

দেশভাগের পর যখন বহু হিন্দু পরিবার পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে জড়ো হলেন, তখন এই রাজ্যের সরকারের ভারী চিন্তা হল। এতজন মানুষ থাকবেনই বা কোথায়, আর খাবেনই বা কী — এই নিয়ে ভেবে ভেবে সরকার হয়রান। তবে এঁরা অনেকেই নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছিলেন। উঠেছিলেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। আবার অনেকে দল বেঁধে দখল করেছিলেন কলকাতা বা আশেপাশে পড়ে থাকা ফাঁকা জমি। সেই জমিতেই

ভাগাভাগি করে থাকতে শুরু করেছিলেন তাঁরা। তুলেছিলেন দরমার ঘর, তৈরি করেছিলেন ইস্কুল, বাজার, ডাক্তারখানা। এই মানুষগুলোকে বলা হত উদ্বাস্তু আর এই বসতিগুলোকে বলা হত উদ্বাস্তু কলোনি। উদ্বাস্তু হলেন এমন কেউ যাঁকে উৎখাত করা হয়েছে, বা জোর করে সরানো করা হয়েছে তাঁর বাসস্থান (বাস্তু) থেকে। দেশভাগ যেহেতু ভিটেছাড়া করেছিল এই মানুষগুলোকে, তাই তাঁদের জুটেছিল এই উদ্বাস্তু তকমা।

কলোনিতে ঠাঁই পাননি, চেনা-পরিচিতি নেই, টাকা পয়সা বা চাকরি নেই, এমন উদ্বাস্তু ছিলেন বহু। সরকারি সাহায্যই ছিল তাঁদের ভরসা। রাজ্যের নানা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সরকারি শিবিরে, শিয়ালদহ স্টেশনে, ফুটপাথে আর খোলা আকাশের নিচে তাঁদের থাকতে হয়েছিল মাসের পর মাস। রাজ্যের সরকার তাঁদের একটা ঠাঁই জোগাড় করে দেবেন, হাতে কিছু কাজ দেবেন, খাবারের ব্যবস্থা করবেন – এইটুকু ছিল তাঁদের আশা। আর তাঁদের তো সেই আশা থাকতেই পারে। তাঁরা তো আর দেশ ভাগ করেননি, করেছিলেন দেশের বড় বড় নেতারা। তারপরই যত অশান্তি, মারপিট, দাঙ্গা। দুই দেশের সরকার যখন সেই মারপিট থামাতে পারেননি, তখনই তো পালিয়ে আসতে হয়েছিল এই মানুষগুলোকে। এখন তাঁদের থাকা-খাওয়া, দেখাশুনোর দায়িত্ব তো সরকারেরই হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারের মাথায় তখন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। এইসব উদ্বাস্তুদের নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এতগুলো মানুষের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা তো সহজ কথা না! বিপুল

খরচ তাতে, আর দরকার লোকজন, জায়গা-জমি। বিধান রায় মনে করতেন সব রাজ্যেরই ভাগাভাগি করে নেওয়া উচিত এই বিরাট দায়িত্ব, আর ভারত সরকারের উচিত টাকা পয়সা দিয়ে রাজ্যগুলোকে এই কাজে সাহায্য করা। কিন্তু ভারত সরকার তখন পঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের নিয়ে নাজেহাল, বাংলার দিকে তাকানোর সময় নেই তাঁদের। এইরকম সময়ে হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল বিধান রায়ের মাথায়। তিনি বললেন যে আন্দামানের দ্বীপে পূর্ব বাংলা থেকে আসা মানুষদের কাউকে কাউকে পাঠানো হোক। এই দ্বীপগুলোতে লোকজন কম, অনেক ফাঁকা জমি, নদীনালা, সমুদ্র। এখানে এই উদ্বাস্তুরা গিয়ে মাছ ধরে, চাষ-বাস করে দিব্যি খেয়ে-পরে থাকতে পারবেন। দিল্লি থেকে ভারত সরকারও সায় দিলেন এই ব্যবস্থায়। তাঁরা জানতেন যে আন্দামানে চাষবাস বাড়লে গোটা দেশেরই মঙ্গল। বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন কাজের মানুষ। মাথায় চিন্তা আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা তাঁর করে ফেলা চাই। ১৯৪৯ সালের গোড়াতেই বিধান রায়ের উৎসাহে প্রথম উদ্বাস্তু দল কলকাতা থেকে জাহাজে চেপে পৌঁছে গেলেন আন্দামানে। তাঁরা সবাই চাষি মানুষ, পূর্ব বাংলায় তাঁরা ধান-পাট চাষ করে পেট চালাতেন। আন্দামানেও তাঁদের দেওয়া হল জমি, লাঙল, চাষের বলদ আর ধানের বীজ। এরপর প্রতি বছরই আন্দামানে ছোটছোট দলে উদ্বাস্তু পাঠাতেন পশ্চিমবঙ্গের সরকার। বাছাই করে পাঠানো হত চাষি, জেলে আর কখনও কখনও মিস্ত্রিদের। এমন লোককেই আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হত যাঁদের সেখানে কাজের সুযোগ আছে।

আমাদের মনে হতেই পারে যে বেশ ভাল উপায় বার করেছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। মানুষগুলোর সুবিধা হল, আন্দামানেও চাষবাস বাড়ল, আর পশ্চিমবঙ্গে ভিড় কমল। এ কথাগুলো সবই ঠিক। কিন্তু একটু অন্যভাবেও ভাবা যায় হয়তো। এই মানুষগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছেই শুনলেন যে তাঁদের সেখানে জায়গা নেই। সরকার তাঁদের ব্যবস্থা করেছেন অজানা-অচেনা দ্বীপে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। সেই দ্বীপে আছে ঘন জঙ্গল, জীবজন্তু, অচেনা মানুষ। সেই দ্বীপে যাওয়া-আসা একমাত্র সরকারি জাহাজেই হয়। তাই সেখানে পৌঁছে ভাল না লাগলেও পালিয়ে আসার জো নেই। এ তো একরকম বন্দীদশা। তবে এই বন্দীদশা সবার জন্য নয় কিন্তু। কোনও ডাক্তার, কবিরাজ, মাস্টার, ব্যবসায়ী বা জমিদারকে কিন্তু আন্দামানে পাঠানো হয়নি। পাঠানো হয়েছিল শুধু খেটে খাওয়া চাষি, জেলে, কামার, মিস্ত্রিদের। এই গরিব উদ্বাস্তুদের প্রায় সবাই ছিলেন দলিত, আর বড়লোক উদ্বাস্তুরা প্রায় সবাই সমাজের চোখে 'উঁচু জাত'। বুঝতেই পারছ যে দেশভাগের অভিজ্ঞতা এক এক মানুষের এক এক রকম। মেয়েদের একরকম, গরিব মানুষের একরকম, পঞ্জাবে আর বাংলায় আবার ভিন্ন ভিন্ন, আর জাতপাতের বিচারেও এক এক জনের এক এক রকম।

আরও ক'টা কথা বলে রাখি এখানে। শুধু আন্দামান নয়, দলিত খেটে খাওয়া উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের সরকার ভারতের নানা জায়গায় পাঠিয়েছিলেন। ঐ যে বললাম বিধান রায় মনে করতেন উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব সকলের, শুধু পশ্চিমবাংলার নয়। ওড়িশা, বিহার থেকে শুরু করে

সুদূর উত্তর ভারত, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ বা দক্ষিণ ভারত কোনও জায়গাই বাদ ছিল না। এসব জায়গায় যে উদ্বাস্তুরা গিয়ে ভাল ছিলেন, তা নয়। অচেনা জায়গা, অচেনা ভাষা আর কাজের অভাবে তাঁরা অনেকেই খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। কেউ কেউ পালিয়ে চলে আসতেন পশ্চিমবঙ্গে, রাত কাটাতেন রাস্তা বা রেল স্টেশনে। অনেকে পালিয়ে ফিরে যেতেন পূর্ব পাকিস্তানে। এভাবে দেশভাগ এই মানুষগুলোকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, সেখান থেকে আবার অন্য কোথাও। থিতু হতে হতে কেটে গিয়েছিল বহু বছর। এঁদের জীবনে দেশভাগের শুরু ১৯৪৭ সালে ঠিকই, কিন্তু শেষ যেন এক এক জনের জন্য এক এক সময়ে। তবে কী আশ্চর্য মনের জোর এই মানুষগুলোর! হাল ছেড়ে দেননি তাঁরা কখনও। খুঁজে বেড়িয়েছেন কোথায় একটু কাজের সুযোগ আছে, আছে মাথা গোঁজার ঠাঁই আর দুমুঠো ভাত।

ইতিহাসে তো রাজারাজড়াদের নামই আমরা পড়ি, আর পড়ি নেতাদের নাম। কিন্তু এই অচেনা অজানা মানুষদের রোজকার কষ্ট, লড়াই আর আনন্দও কিন্তু একইরকম জরুরি মনে রাখা। দেশভাগের ইতিহাস কেউ জানতে চাইলে তোমরা র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কথা অবশ্যই বোলো। বোলো জিন্নাহ আর নেহরুর কথাও। কিন্তু পাশাপাশি দেশরাজ, নাসির, বীথি বা আন্দামানের মানুষগুলোর কথাও বলতে ভুলো না যেন। আর জয়মণি তো আছেই। এদের সবার গল্পেই টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে আছে দেশভাগের ইতিহাস।

(৭) শেষের কথা

তোমরা হয়তো ভাবছ এইসব গল্প আমি কোথা থেকে জানলাম, বানিয়ে বানিয়ে বলছি না তো? একদমই না। এই সব গল্পই সত্যি ঘটনা এক্কেবারে। সরকারি কাগজপত্র ঘেঁটে আর ইতিহাসের পণ্ডিতদের লেখা পড়ে এসব জেনেছি আমি। জয়মণি হাতির কথা পড়েছি বাংলাদেশের সরকারি মহাফেজখানায়। সরকারি মহাফেজখানা বা গভর্নমেন্ট আর্কাইভ হল একটা অফিস যেখানে সরকারি দপ্তরের সব পুরনো কাগজপত্র ফাইলবন্দী থাকে। ইতিহাস নিয়ে যারা অনেকদূর পড়াশোনা করে বইপত্র লেখেন, তাঁদের দেখতে দেওয়া হয় এইসব ফাইল। ফাইলের নম্বরটাও তোমাদের বলে রাখি - F. No. 3c1-6/1949; Political, Branch–Confidential Report (CR), 'B' Proceedings, Bundle No. 2, List number 119। কোনওদিন যদি ইতিহাস পড়ে বাংলাদেশের মহাফেজখানায় গিয়ে কাগজপত্র ঘেঁটে দেখো, এই ফাইলটা খুঁজে জয়মণির গল্পটা মিলিয়ে নিতে পারো। দেশরাজের জীবনের কথা আমি পেয়েছি অন্য আরেক ধরণের মহাফেজখানায় – তার নাম '১৯৪৭: পার্টিশন আর্কাইভ'। এইখানে রয়েছে দশ হাজারেরও বেশি এমন মানুষের সাক্ষাৎকার যাঁরা দেশভাগ দেখেছেন, দেশভাগের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে সংসার পেতেছেন। এই সাক্ষাৎকারের খানিকটা তোমরাও পড়তে পারো কম্প্যুটারে, এই ওয়েবসাইটে গিয়ে – https://in.1947partitionarchive.org/। তবে পুরোটা শুনতে বা পড়তে গেলে তোমাদের আরেকটু বড় হতে হবে, কলেজ-ইউনিভার্সিটির গণ্ডি

পেরোতে হবে। বীথির কথা আর নাসিরের কথা আমি পড়েছি দুজনের লেখায়। গার্গী চক্রবর্তী বলে একজন ইতিহাসবিদ আছেন। তাঁর বই *Coming Out of Partition: Refugee Women in Bengal* বইতে পাবে বীথির গল্প। মালিনী শূর বলে আরেকজন সমাজবিজ্ঞানী আছেন, তাঁর কাজ ভারত-বাংলাদেশের বর্ডারের কাছে থাকা মানুষজনকে নিয়ে। তাঁরই ২০১৬ সালে ছাপা একটা লেখা – 'Battles for the golden grain : paddy soldiers and the making of the Northeast India-East Pakistan border, 1930-1970' – পড়লে নাসিরের কথাও জানতে পারবে তোমরা। এছাড়া আরও কিছু বইপত্র পড়তে হয়েছে আমায়। এক দুই করে ফর্দ করে দিই:

ক) হৈমন্তী রায়ের লেখা *The Partition of India: Oxford India Short Introduction* (২০১৮)।

খ) উদিতি সেনের লেখা *Citizen Refugee: Forging the Nation after Partition* (২০১৮)।

গ) আবুল মনসুর আহমেদের আত্মজীবনী *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (১৯৬৯)।

ঘ) অশোক মিত্রের আত্মজীবনী *তিন কুড়ি দশ* (১৯৫৯)।

এই বইটা লেখার জন্য আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন অচিন চক্রবর্তী, সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী, মানবী মজুমদার, রাজর্ষি দাশগুপ্ত, সেমন্তী ঘোষ, সাবির আহমেদ, কৃত্তিকা সেনগুপ্ত, তনিকা সরকার, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিনী ঘোষ, প্রিয়ঙ্কর দে, উপনীতা মুখার্জি, অশোকেন্দু সেনগুপ্ত, অর্পিতা সেনগুপ্ত, সুপূর্ণা মুখার্জি, কৌস্তুভ মণি সেনগুপ্ত, অমিতাভ গুপ্ত, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পারমিতা চক্রবর্তী, মধুমিতা বসু, মালিনী মুখার্জি, ঐষিক চ্যাটার্জী, সুব্রত মুখার্জি, আরশি পারভিন গুপ্ত, রাইশা মাহমুদ, মোহর সেনগুপ্ত, ঐশী দত্ত, রূপকথা, তিস্তা দাস, দেবারতি বাগচী। এঁরা সকলেই লেখার খসড়া পড়ে কোথায় কী বদল করা দরকার, কী কী ভুল হচ্ছে এগুলো ধরিয়ে দিয়েছেন। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

লেখক ও শিল্পী পরিচয়

এই বইটি লিখেছেন অন্বেষা সেনগুপ্ত। অন্বেষা ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতাতে ইতিহাস পড়ান।

বইটির চিত্র-পরিকল্পনা, প্রচ্ছদ ও মানচিত্র তৈরি করেছেন ওয়াসিম হেলাল। ওয়াসিম পেশায় গ্রাফিক ডিজাইনার। নানা দেশী বিদেশী প্রকাশনা সংস্থার সাথে ওয়াসিম বইএর ছবি, প্রচ্ছদ ও চিত্র-পরিকল্পনার কাজ করেন।

বইটির ছবি এঁকেছেন রঞ্জিত চিত্রকর ও সিরাজউদ্দৌলা চিত্রকর। তাঁরা বংশ পরম্পরায় পটশিল্পী। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার নয়াগ্রাম থেকে কাজ করেন রঞ্জিত ও সিরাজ। পটশিল্পের ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁরাও মূলত হিন্দু দেব-দেবীর আখ্যান আঁকেন ও সেই নিয়ে গান বাঁধেন। তবে এখন তাঁরা নানা অন্য বিষয় নিয়েও পট তৈরি করছেন। পটচিত্র বাংলার ধর্মীয় সমন্বয়ের ঐতিহ্যের প্রমাণ। পটশিল্পীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁরা মূলত হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে তাঁদের ছবি আঁকেন ও গান বাঁধেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের নিজস্ব সামাজিক আখ্যান অনুসারে তাঁরা হিন্দু দেবতা বিশ্বকর্মার বংশধর। এভাবে তাঁদের জীবনে ও কাজে ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম মিলেমিশে রয়েছে।

The **Institute of Development Studies Kolkata (IDSK)** was set up in 2002 by the Government of West Bengal as an autonomous centre of excellence in social sciences. It is a society with an autonomous governing body with eminent scholars and Government's nominees. IDSK is recognized for its advanced academic research and informed policy advice in the areas of literacy, education, health, gender, employment, technology, communication, human sciences and economic development. The academic programmes at IDSK include MPhil (2006-2022) and PhD in social sciences and short training courses for research scholars. It offers state-of-the-art IT and library facilities to its students and research scholars. It is fully funded by the Government of West Bengal. IDSK has been recognized by the ICSSR under the category of "ICSSR Recognized Research Institutes".

The **Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)** is a German political foundation that is part of the democratic socialist movement. True to the legacy of its namesake Rosa Luxemburg (1871-1919), it stands in solidarity with the workers' and women's rights movements. the organization serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as research centre for social development. The RLS has close ties to the German party DIE LINKE. RLS provides political education and a centre for advanced social research in both Germany and throughout the world. RLS is one of six party-affiliated political foundations in Germany; it supports partners in over 80 countries striving for social justice, strengthening public participation, and social ecological development.

চোখ-কান খোলা রেখে ইতিহাস শেখা যায় কেমন করে? ইতিহাস-সচেতন হওয়া কাকে বলে? এইসব প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে 'ইতিহাসে হাতেখড়ি' সিরিজের কথা ভাবা। একেকটি বই একেকটি বিষয় নিয়ে। লেখার সঙ্গে থাকছে পটচিত্র শিল্পীদের আঁকা ছবি। ইতিহাসের নানা সময়, নানা জটিল ধারণা সহজভাবে বুঝিয়ে বলাই এই বইগুলোর উদ্দেশ্য। বইগুলো পড়ে ছোটরা প্রশ্ন করতে শিখবে - এমনটাই আমাদের আশা।

IDSK

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA